প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ সিনেমা যখন ইতিহাসের দলিল

আবীর মজুমদার

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠা করেছে ধর্মরাজ্য। তার জন্য মূল্যও কম দিতে হয়নি। অসংখ্য যুবকের রক্তে প্লাবিত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের মাটি। বিষণ্ণ কৃষ্ণ আনমনে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণকে বললেন, 'পারিবারিক দ্বেষ, ঘৃণা, দম্ভর পরিণতি এই শ্মশানভূমি'। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে কৃষ্ণর। ধর্মপ্রতিষ্ঠা তখনো বাকী। পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ সবিতা বন্দনা করলেন।

"ভুবনে ঐ বিশাল নয়ন তপন
উঠুক জাগিয়া
শুভ কল্যাণ লাগিয়া।
পথে পথে যত পর্বতরাশি
চারিদিক হতে পড়ুক শীর্ষে
শুভ কল্যাণ ঝরিয়া
তপন উঠুক জাগিয়া।"

শুভ কল্যাণ আহ্বান করে কৃষ্ণ ফিরে গেলেন দ্বারকায়। তারপর দীর্ঘদিন ইন্দ্রপ্রস্থে যায়নি কৃষ্ণ। অনেক কাল পরে তার মন ব্যাকুল হল। যে শান্তি-ধর্মের জন্য এত রক্তপাত সেই যুদ্ধের পর কেমন আছে যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্যের মানুষজন। যাত্রা করলেন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে। তখন সূর্যের গোধূলি আলো দিগন্ত রেখা ছুঁয়েছে। নেমে আসছে অন্ধকার। হঠাৎ কৃষ্ণ কয়েকজন মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। আড়াল থেকে শুনতে লাগল তাদের কথা। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একজন বলল, "তাড়াতাড়ি চল না হলে দস্যু ধরবে।" আরেকজন উত্তর দিল, "দস্যু কেন বলছ। বল বিধবা মেয়ে দস্যু।" আরেকজন বলল, "দেশ উচ্ছন্নে গেছে। পেটে ভাত নেই, কাজ নেই, শান্তি নেই, যেদিকে তাকাও শুধু মেয়ে মানুষ। দেশটা পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে। খামারগুলো জঙ্গল হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য উঠে গেছে। জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। দেশটা উচ্ছন্নে গেছে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে কৃষ্ণ অন্ধকারে মেয়ে মানুষের গলা শুনতে পেল। কারা যেন বলছে, "পুরুষ ছাড়া জীবন ব্যর্থ।" জ্বলন্ত মশালের আলোয় কৃষ্ণ রমণীর জ্বলজ্বল চোখ দেখতে পেল। বেশভূষায় তাদের শালীনতা নেই। একজন মহিলা বলছে, "স্বামী নেই পুরুষ নেই এই রিক্ত শূন্য জীবন নিয়ে কি করব।" বিষণ্ণতা তীব্র হল কৃষ্ণের। কোথায় ধর্মরাজ্য। এত এক মৃত্যু উপত্যকা। তাহলে কী লাভ হল কুরুক্ষেত্রে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ করে?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল ভিন্ন। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসও দেখতে দেখতে পার করে ফেলল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০০ বছর। কিন্তু পরিণতি বোধহয় একই ছিল দুই যুদ্ধের। ১৯১৪ সালে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জন্ম দিয়েছিল এরকমই এক করুণ পরিণতির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হস্তিনাপুরকে পুরুষ শূন্য করেছিল। নারীরা নিঃসঙ্গ, রিক্ত হয়েছিল। তেমনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

জন্ম দিয়েছিল 'ডিয়ার জন লেটার'-এর। বাড়ি থেকে বহুদূরে ট্রেঞ্চে বসে আছে বাড়ির পুরুষরা। বাড়িতে অপেক্ষারত তাদের স্ত্রীরা শুধু চিঠির অপেক্ষায়। তারপর একদিন চিঠি দিতে আসা পোস্টম্যানকেই ভালোবেসে ফেলল বহু নারী। দূরদূরান্তে যুদ্ধরত স্বামীদের উদ্দেশে অনেকেই চিঠি লিখে ফেলল– "ডিয়ার জন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আমাদের ভালোবাসা কেড়ে নিল। তোমার চিঠি দিতে আসা পোস্টম্যানকেই ভালোবেসে ফেললাম।" (সূত্র ঃ অকিঞ্চিৎ-অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়)। কুরুক্ষেত্রের মত প্রথম মহাযুদ্ধও পালটে দিয়েছিল মানুষের জীবনবোধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে আহ্বান করেছিল সিংহাসন লোভ, দ্রৌপদীর অপমান এবং শকুনির দুটো পাশা। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে নিমন্ত্রণ দিল সাম্রাজবাদীদের যুদ্ধ জয়ের লোভ, সার্বিয়ার যুবরানি সোফিয়ার হত্যা এবং এক গুপ্ত ঘাতকের পিস্তল থেকে ছোঁড়া দুটো বুলেট।

ইউরোপের দেশগুলির উদ্বৃত্ত পুঁজির বেশির ভাগ লগ্নি করা হয়েছিল রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায়। ফ্রান্স ও ইতালির উদ্বৃত্ত পুঁজি না থাকলেও তারা উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। আসল কারণ ছিল শিল্পের কাঁচামাল এবং ব্যবসার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার দখল। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ গ্যাম্বেটা বলেছিলেন, 'To remain a great nation or to become one you must colonize'। আর ইংরেজ কবি রুড ইয়ার্ড কিপলিং ব্রিটিশের পদানত জাতিগুলিকে বলেছিলেন, 'আধা শয়তান আধা শিশুদের সভ্য করার দায় সাদা মানুষের।' বিসমার্ক-এর নেতৃত্বে জার্মানি পশু শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রাশিয়াকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। জার্মানি-ফ্রান্স বৈরিতা শুরু হয় ১৮৭০-৭১ সালে যখন ফ্রান্স জার্মানির কাছে হেরে অলিসাস, লোরেন হারায় এবং মর্যাদার লড়াইয়ে জার্মানের কাইজার (দ্বিতীয় উইলিয়াম) জার্মানকে শ্রেষ্ঠ জাতি ঘোষণা করে।

১৯০৭ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে। ইউরোপের বলকান নামে অঞ্চলটি তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কি শব্দে বলকান শব্দের অর্থ হল পাহাড়। এই অঞ্চল ছিল সার্ব, বুলগার, গ্রীক, আলবেনিয়া জাতির মিলনক্ষেত্র। বলকান অঞ্চলের প্রশ্নে অস্ট্রিয়া-সার্বিয়া, সার্বিয়া-বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার প্রতিযোগিতা পূর্ব ইউরোপকে অশান্ত করে তোলে। ১৯০০ সালে উ: আফ্রিকা, দ: আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। জার্মানি ইতালির জন্য পড়ে থাকে স্বল্প অঞ্চল। জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে নৌশক্তির আধিপত্য নিয়ে প্রতিযোগিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

বিসমার্ক ১৮৭৯তে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি এবং ১৮৮২তে ইতালিকে টেনে এনে ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। এবং ফ্রান্সকে কূটনৈতিক ভাবে চাপে রাখে। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করে বিসমার্ক। ফ্রান্সের উপর কঠোর শর্তাদি চাপিয়ে দিয়ে ফ্রান্সকে জার্মান-বিদ্বেষী করে তোলে। ১৮৮২ সালে ত্রিশক্তি চুক্তি হয় জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে (Triple Alliance)। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও তার প্রেক্ষাপট রচনা হয়েছিল আগেই। ১৯১১ সালে বলকান অঞ্চলের বিশৃঙ্খলার ফলে ইতালি তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপোলি দখল করে ফেলে। ১৯১২ সালে লৌমেন-এর সন্ধি দ্বারা সুলতান ইতালির এই অধিকার স্বীকার

করে নেন। অন্যদিকে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগোরিয়া মিলে বলকান লীগ নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিল। আলবেনিয়া বিদ্রোহ এবং ত্রিপোলি ইতালি কর্তৃক দখল হলে বলকান রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত হয়। বলকান লীগ ম্যাসিডনিয়ায় খ্রীস্টান অধিবাসীদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতে তুরস্কের সুলতানকে সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করতে বলে। তুরস্কের সুলতান সম্মত না হলে ১৯১২ সালে এই যুদ্ধ বলকান যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়। বলকান যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটে, তুরস্ক তার সাম্রাজ্যের আশি শতাংশ হারিয়ে ফেলে।

তুরস্কের জায়গায় রাশিয়া বলকান অঞ্চলের রক্ষক হয়। এবং কার্যত তুরস্ক, বুলগেরিয়া দুর্বল হয়ে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার তাঁবেদার হয়ে পড়ে। লেনিন এবং লুক্সেমবার্গের মতে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ জন্ম দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। ১৯১৩ সালে চারটি রাজবংশের পতন ঘটল ঃ তুর্কি অটোমাস বংশ, রাশিয়ায় রোমান বংশ, জার্মান জোহেনজোলান রাজবংশ আর গোড়া ক্যাথলিক হ্যানস্‌বার্গ বংশ।

অন্ধকার দিনগুলোতে
তখনও কি গান থাকবে কোন
অবশ্যই থাকবে তখন গান —
অন্ধকার দিনের গান। *শঙ্খ ঘোষ*

দুটো বুলেট দুটো মৃত্যু বদলে দিল সভ্যতার ইতিহাস

প্রথমেই বলেছি মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণতির মতো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিরও অনেক মিল পাওয়া যায়। শুধু পরিণতি কেন, মহাভারতের যুদ্ধে যেমন একই পরিবারের বিবাদ প্রত্যক্ষ করা যায়, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যেও সেই রকম পারিবারিক বিবাদ পরিলক্ষিত হয়। অস্ট্রিয়ায় সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ঐ রাজ্যের সিংহাসনের দাবিদার যুবরাজ ফার্দিনান্দ অস্ট্রো হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত। কারণ তার আগেই আত্মহত্যা করেছেন ফার্দিনান্দের জেঠু জোসেফের ছেলে তাঁর তুতো ভাই যুবরাজ প্রিন্স রুড্‌লফ। তার পরেই মারা যান ফার্দিনান্দের বাবা কার্ল লুডভিগ। জেঠু জোসেফের সাথে ফার্দিনান্দের মোটেই সুসম্পর্ক ছিল না। সোফিয়াকে একপ্রকার জেদ করেই জেঠুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেন ফার্দিনান্দ। কিন্তু ফার্দিনান্দকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল সোফিয়া যুবরানি হবেন না এবং তাদের সন্তানরা সিংহাসন দাবি করতে পারবেন না। যেমন ভাবে মহাভারতের দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি সিংহাসন দাবি করবেন না এমনকি তাঁর সন্তানরা সিংহাসন দাবি করতে পারেন এই সম্ভাবনায় দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি অবিবাহিত থাকবেন।

ফার্দিনান্দ গেলেন সার্বিয়া সমরসজ্জা দেখতে। পথে পেলেন গ্রেনেডের উষ্ণ অভ্যর্থনা। টাউন হল থেকে বেরিয়ে সারাজোভার রাস্তায় এলেন ফার্দিনান্দ। গার্ভিলো প্রিন্সিপ-এর বেলজিয়ান পিস্তলের দুটো গুলিতে মৃত্যু হল ফার্দিনান্দ ও সোফিয়ার। আর তারপরে অভিমুখ বদলে গেল ইতিহাসের। দুটো বুলেট দুটো মৃত্যু রক্ত দিয়ে রচনা করল এক মর্মান্তিক ইতিহাস। এই ঘটনার পরে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে একটা চরম পত্র পাঠায় এবং তা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কার্যকর

করতে বলে। অস্ট্রিয়ার ১০ দফা দাবি মানতে সার্বিয়া অস্বীকার করলে ১৯১৪ সালে ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া সৈন্য সমাবেশ করলে জার্মানরা ১লা আগস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিশক্তি আঁতাতে যোগ দেয়। চীন, জাপান ত্রিশক্তির সঙ্গে আবদ্ধ হয়। তুরস্ক, বুলগেরিয়া যোগ দেয় জার্মানি, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে।

একদিকে জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া অন্য দিকে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স। পরে তুরস্ক, জার্মানির সঙ্গে যোগ দেয়। আর অন্যদিকে ইতালি, জাপান, রাশিয়া ও ১৯১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার যুদ্ধ পরিণত হয় বিশ্ব যুদ্ধে; যেমন কুরুপাণ্ডবের পারিবারিক বিবাদ জন্ম দিয়েছিল কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের।

Things fall apart, the centre cannot hold
Mere anarchy is loosed upon the world
The blood dimmed tide is loosed
And everywhere the ceremony of innocense is drowned

Yeats

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও তার ইতিহাস বন্দী হল সেলুলয়েডে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি হয়েছিল ডেভিড লীনের 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া'। সময়ের এই সন্ধিক্ষণে পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছিল দুই বিস্ময়কর চরিত্রকে। একজন ব্রিটিশ অশ্বারোহী বাহিনীর ফিল্ড মার্শাল ভাইকাউন্ড অ্যালনেবী যিনি জেরুজালেম থেকে তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আরেকজন কবি, প্রত্নতত্ত্ববিদ টমাস এডুয়ার্ড লরেন্স। লরেন্সের সুচতুর নেতৃত্বে আরবের বিবাদরত যাযাবর উপজাতিগুলো একজোট বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল অত্যাচারী তুর্কিদের বিরুদ্ধে। কয়েকশ বছর ধরে খালিফা, সুলতানদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা অতিক্রম করে লরেন্স তার প্রখর বুদ্ধি দিয়ে হারাতে সক্ষম হয়েছিলেন তুর্কিদের। পবিত্র ইসলাম ভূমিকে তার ভূমিপুত্রদের হাতে তুলে দিয়ে আরব থেকে তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লরেন্স। খৃস্টান ও ইহুদীদের পবিত্র তীর্থভূমি প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করেছিলেন অ্যালনেবী আর লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের পবিত্রভূমিকে মুক্ত করে প্রাচ্য রূপকথার দেশে এক নতুন ইতিহাস গড়লেন লরেন্স।

আয়ারল্যাণ্ডের আদিবাসীদের পরিশ্রমী রক্ত তো ছিলই তার সঙ্গে প্রখর বুদ্ধি দিয়ে লরেন্স বশ করলেন অবাধ্য কুর্দ, তুর্কেমেন, আর্মেনিয় আরব কুলীদের। আবিষ্কৃত হল হিটাইট সাম্রাজ্যের রাজধানী কারবোমিস। ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া আর তুরস্কের প্রতিনিধিরা অলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল 'আলেক জানদ্রে' থাকবে জার্মানির দখলে আর ভারত এবং দূর প্রাচ্যের নাগাল পাওয়ার সুবিধার জন্য বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হবে। ৭ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে লরেন্স অর্জন করল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তুরস্ক, সিরিয়া প্যালেস্টাইনের সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান লরেন্সকে প্রস্তুত করল যুদ্ধের জন্য। ১৯১৫ সালে আরবের নিষিদ্ধ নগরী হেজাজের বাসিন্দারা বিদ্রোহ করে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে।

ইতিহাস বলছে বহু শতাব্দী আগে মোজেল যখন মিশর থেকে ইজরালের সন্ততিদের পথ

দেখিয়ে নিয়ে আসছে, খুফু যখন পিরামিড বানাচ্ছে তারও আগে এই অঞ্চলে আরও সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। যার সময় তুতেনখামেনেরও আগে। কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের বাণী প্রচারের আগে আরবরা আইনসংহিতা লিখেছিলেন। আরব অভিযান মক্কা থেকে শুরু করে আরাবা হয়ে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার দামাস্কাসে আর আলাপ্পাতে গিয়ে থেমেছিল। আরব শব্দটি এসেছে হেজাজের দক্ষিণে ক্ষুদ্র অঞ্চল আরাবা থেকে। মেসোপটেমিয়া ছাড়া আরবের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিলো ইয়েমেন প্রদেশ। এই সাম্রাজ্য আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় ছিল। এই সাম্রাজ্য শিখরে উঠেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে।

৭৩২ খৃস্টাব্দে আরব সাম্রাজ্যের তুয়ের যুদ্ধে মারতেলের নেতৃত্বে খৃস্টানরা ফ্রান্সের মাটিতে আরবদের পর্যুদস্ত করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আধা কুর্দ সালাদিনের বংশধররা আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছিল। তুরস্কদের পূর্বপুরুষ ওথমান জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আরবদের উপর। তুর্কিরা ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল আরব দেশে। সেখানেই তুর্কিরা সেনা ছাউনি করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই সেনাছাউনি থেকেই তারা আক্রমণ করত। আরব সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে হাজার বছর ধরে সেনাপতি খালিফারা আরববাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেও লরেন্স হারিয়ে দিয়েছিল তুর্কিদের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আর ইতালির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। অস্ত্র নেই বলে শান্ত হয়ে থাকলেন শেরিফ লুসেন। চিঠি লিখে তিনি ব্রিটিশদের জানান তারা তুর্কিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। সাহায্য আসার আগেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তুর্কিদের উপর। ১৯১৬ সালে কায়ারোতে গুপ্তচর বাহিনীতে সুখ্যাতি অর্জন করল লেফটেন্যান্ট লরেন্স।

লীনের ছবিতে দেখানো হল সিনাইয়ের উত্তরে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধরত তুর্কিদের হারিয়ে দেওয়াই ছিল লরেন্সের উদ্দেশ্য। লরেন্স পৌঁছে গেল জেড্ডায়। তুর্কিরা সিরিয়া থেকে সৈন্য পাঠাল সঙ্গে ঘোড়া, গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র। গেরিলা পদ্ধতিতে বোমা মেরে গাড়িগুলো লুঠ করে নিল লরেন্সের গেরিলারা। সৈন্য সংগ্রহ করার এক অদ্ভুত পদ্ধতি নিয়েছিল লরেন্স এবং ফয়জল। দুজনে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এগোতো আর বেদুইনের তাঁবু দেখলেই তাদের সংঘবদ্ধ করত। এইভাবে হার্ব, জুহেইনা আর বিল্লি উপজাতিদের নিয়ে দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হল। আরবদের অমূল্য সাহায্যে ব্রিটিশ বাহিনীর লরেন্স আরব বেদুইনদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল তুর্কিদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে ফয়জল, আলি, আবদুল্লাকে নিয়ে লরেন্স ২৫টি তুর্কি ট্রেন ধ্বংস করল। ১৫ হাজার মাইল রেল লাইন উপড়ে ফেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হল। ১৯১৭ সালে ২১ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হল। আরবে তুর্কিদের আক্রমণ বদলে দিল প্রাচ্যের ইতিহাস। চমকপ্রদ যুদ্ধ করে লরেন্স ধ্বংস করল তুর্কি বাহিনীকে। এক লাখের উপর তুর্কিসেনাকে বন্দী করে তারা এক মাইলের বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছিল। দামাসকাস মুক্ত হল তুর্কি অত্যাচার থেকে।

তুর্কিদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ফয়জলকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান করে লরেন্স পাড়ি দিলেন লণ্ডন। দামাসকাসে আরবরা তাদের রাজধানী স্থাপন করে নিজেরাই শাসন করতে লাগল আরবভূমি। ফ্রান্স পেল বেইরুথ, আর ব্রিটেন পেল প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ। লরেন্স হয়ে উঠলেন লণ্ডনের নায়ক।

আর লরেন্স অব অ্যারাবিয়া হয়ে থাকল সেলুলয়েডে ইতিহাসের এক বিশ্বাসযোগ্য দলিল যা ক্যামেরাবন্দী হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা পৃথিবীতে।

পশ্চিম রণাঙ্গন তখন শান্ত ছিল

এরিক মারিয়া রেমার্কের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিয়ে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' নিয়ে ছবি বানিয়েছিলেন লুইস মাইলস্টোন। রেমার্কের এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। রেমার্ক স্কুল পেরিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এক এক করে তাঁকে দেখতে হয়েছে বন্ধুদের মৃত্যু। রেমার্কের বিশ্বাস ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবী জুড়ে এক সুশাসন কায়েম করবে। যুদ্ধে গেছিলেন কবি উইলফ্রেড আওয়েন। লড়তে লড়তে মারা গেলেন তরতাজা যুবক আওয়েন। পকেটে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ইউরোপের যুবসমাজের একটা বড় অংশ যুদ্ধে যোগ দেয়। (সূত্র ঃ হত্যার দিনগুলিতে গান — অভীক মজুমদার) অক্সফোর্ড-কেমব্রীজের ১/৩ অংশ ছাত্র গেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জার্মানি আইন করে ১৭-৫০ বছরের পুরুষদের যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামূলক। মাইলস্টোনের ছবিতেও আমরা এরকম দেখতে পাই। ছবি শুরু হয় টাইটেলে রেমার্কের বক্তব্য দিয়ে — The story is neither an accusation nor a confession and least of all an adventure to those who stand face to face with it. It will try simple to tell of a generation of men who even though they may have escaped its shells, were destroyed by the war.

রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা মার্চ করছে। গোটা শহর জুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি। কলেজে মাস্টারমশাই মি. মায়ার লেকচার দিচ্ছেন। ছাত্রদের তিনি বলছেন, 'We have to save our fatherland, you are the life of country. You are the iron man of Germany'। 'কেউ বলবে তোমরা ছোট, তোমাদের বাবা, মা, বাড়ি আছে, তোমাদের মায়েরা এত দুর্বল নয় যে তারা সন্তানদের দেশরক্ষা করতে বাধা দেবে।' তিনি আরও বলেন, 'which must have, to the lips of may a Roman when he stood embattled in foreign land.'

মি. মায়ার ছাত্রদের একটা ল্যাটিন প্রবাদ বলে উদ্বুদ্ধ করেন - 'Delce et deco veumest protria mori'। তিনি বলেন, 'আমি জানি অনেক উচ্চাশা আছে তোমাদের, অনেকে লেখক হতে পারো, শিলারের মত। কিন্তু এখন পিতৃভুমি তোমাদের ডাকছে, তোমরা নিজেদের স্বপ্ন ফেলে দেশের জন্য যুদ্ধ কর'। রেমার্কের উপন্যাসের নায়ক পল, ক্রুস, মুলার, অ্যালবার্ট যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে তারা ক্লাসের মধ্যে উড়িয়ে দেয়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে পল এবং তার বন্ধুরা প্রথমে দাঁড়ি কামায়। এবার পিতৃভূমিকে বাঁচাতে তাদের জীবন দিতে হবে। পল ডায়েরীতে লিখে রাখে নিজের অভিজ্ঞতার কথা — 'রাত্রি চড় চড় শব্দ করে চলেছে, ফ্রন্টে ঢাকের বাজনার আসর বসেছে। আমার শরীর নড়ছে, গ্রন্থিগুলো সবল মনে হচ্ছে। গভীর নিঃশ্বাস নিচ্ছি। রাত্রিজীবন আমি জীবন্ত।'

ট্রেঞ্চে বসে প্রতিদিন মৃত্যুর ভয়াবহতা পরিলক্ষণ করছে পল। বন্ধুদের, সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে মেঠো ইঁদুর। 'এই ইঁদুরগুলো ভয়ানক ক্ষুধার্ত। সকালে উঠে দেখি ইঁদুর

খুবলে খেয়েছে। ইঁদুর কামরালে অংশ কেটে প্রাডয়াল করতাম। ইঁদুরেরা পরিখার মধ্যে মায়াজাল বিস্তার করে চলেছে। তারা যেন জনশূন্য স্থানে বিচরণ করছে।' (অল কোয়াইট অন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট)

পোড়া জমি, ফাঁপা মানুষ অবক্ষয় বাতাসের
মৃত্যু দীর্ঘশ্বাস, ভাঙা কাঁচের উপর
ইঁদুরের আনাগোনা নিশ্চল অঙ্গভঙ্গি *বিষ্ণু দে*

ট্রেঞ্চে বসে ভয়ঙ্কর বোমা বর্ষণের শব্দ, গুলির লড়াই পলকে পাগল করে দেয়। পল বলে ওঠে, 'stop it I can't listen to that'. দেশপ্রেমের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক মৃত্যু বিভীষিকা। পল লিখে রাখে– 'এই রহস্যময় কুয়াশা মৃতদেহের উপর দিয়ে চলতে চলতে শেষ জীবনরস শোষণ করে। সকালে বিবর্ণ এবং সবুজ মৃতদেহগুলির রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যাবে।'

গাছের তলায় মৃত মানুষ ঝুলে আছে। একটা উলঙ্গ সৈনিক গাছের কাঁটায় আটকে আছে, তার শিরস্ত্রাণ তখনো মাথায়। তার শরীরের উপরের অর্ধাংশ বসে আছে। পা দুটো নেই, কোমর থেকে নিচের অংশ অবলুপ্ত।

পল শত্রুকে মারতে চায় না। মৃত্যু তার কাছে বিভীষিকা। পল তার শত্রুকে বলে, 'যদি তুমি তোমার ইউনিফর্ম আর বন্দুকটা ফেলে দিতে তাহলে তুমি আমার ভাই হতে পারতে।' পকেট থেকে মৃত ব্যক্তির চিঠি পেয়ে পল শত্রুর মৃতদেহের সামনে তার বাবা-মা ও স্ত্রীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

অ্যালবার্ট আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। পল বলে, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আমাদের বাড়ি যেতে হবে।' পল ছুটিতে বাড়ি আসে। পলের মা অসুস্থ। পল তার কলেজে অধ্যাপকের সাথে দেখা করতে যায়। অধ্যাপক পলকে আদর্শ দৃষ্টান্ত করে তার ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি ছাত্রদের শোনাতে থাকেন পলের আদর্শ, ত্যাগ, বীরত্বের কাহিনি। ঠিক এইখানেই ছবি একটা নাটকীয় মোড়ে এসে পৌঁছায়। পল তার অধ্যাপকের বিরোধিতা করে বলে, 'আমরা ট্রেঞ্চে থাকি আমরা মরতে চাই না। আপনি মনে করেন দেশের জন্য মৃত্যু খুব আনন্দের কিন্তু তা নয়, Its a dirty painfull to die for your country.'

অসংখ্য মানুষ মরে চলেছে দেশের জন্য কিন্তু তাতে কার কি লাভ হচ্ছে। পল বলে, 'দেশ যেন শাসকগোষ্ঠির একচেটিয়া। একমাত্র তারাই দেশভক্ত। তারাই সকলকে দেশ ভক্তি শেখায়। অথচ তারা দেশকে চেনে না। দেশকে ভালোবাসে না। আমাদের ডাকেই দেশমাতা সাড়া দেন – শয়তানের ডাকে নয়।' এই কথাটুকুতেই পল স্পষ্ট করে দেয় যুদ্ধবাজ দেশনেতাদের আসল স্বরূপ। যুদ্ধ আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবসা বৃদ্ধির মতলব। 'আমাদের প্রত্যেকটা দিন বছরের মত আর প্রতিটা রাত শতবর্ষের মত দীর্ঘ। আমরা মৃত্যু খেয়ে বেঁচে থাকি আর আমাদের রাতগুলো মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ'।

'We sleep and eat with death'। দেশের নামে, আদর্শের নামে এই মিথ্যে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পল ধরে ফেলেছে। আজ তার কাছে এই যুদ্ধ অনর্থক।

যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। পশ্চিম রণাঙ্গন তখন শান্ত। পল বাড়ি ফিরে যাবে। ট্রেঞ্চে বসে

পল দেখতে পায় একটি প্রজাপতি। তার ডানায় ডানায় স্বপ্নের রঙ। দুঃস্বপ্নের মৃত্যু নীরবতা পার করে পল প্রজাপতির দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা গুলি স্তব্ধ করে দেয় পলের স্বপ্ন। মৃত্যু হয় পলের। শেষ দৃশ্যে সুপার ইমপোস করে পরিচালক দেখান সৈন্যরা বাড়ি ফিরে চলেছে। পলও হাঁটছে। তবে তার গন্তব্য মৃত্যু। ফিরে তাকায় পল। যেন দর্শকদের প্রশ্ন করছে– 'কি পেলে এই যুদ্ধ করে।'

আর ডেলবার্ট মানের পরিচালনায় 'অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এ শেষ দৃশ্যে দেখা যায় পল ট্রেঞ্চে বসে বিদায় বেলায় একটি শুকনো গাছের ছবি আঁকছে। গাছের উপর একটা লার্ক পাখি। পাখিটা উড়ে গেল। লার্ক পাখিটিকে খুব তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন পরিচালক। পৃথিবীর দুই বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং শেলী তাদের কবিতায় (Sky Lark) উল্লেখ করেছেন এই পাখির কথা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন–

Type of the wise who sour, but never roam.
Tree to the kindred points of heaven and home.

একদিকে পলের আদর্শের টানে লড়াই অন্যদিকে চিরন্তন বাড়ির টান। মান-এর ছবিতে আমরা দেখি পল ক্লাসরুমে জানলার ধারে বসে একটি লার্ক পাখির ছবি আঁকছে। ক্লাসের লেকচারে তার মনোযোগ নেই। স্যার, পলকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেন এটা ছবি আঁকার জায়গা নয়। কিন্তু পলের মনের মধ্যে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা শিল্পীসত্তা তাকে পাখিটির পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তরুণ পল স্বপ্ন দেখে। শেলীর Ode to the skylark কবিতার সেই চিরন্তন লাইনগুলো মনে পড়ে–

Higher still and higher from the earth,
Thou springest like a cloud of fire,
The blue deep thou wingest, and
Singing still dost soar, and
Soaring ever singest.

কিন্তু গভীর নীলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাওয়া হয় না পলের। পিতৃভুমি রক্ষার্থে তাকে যেতে হয় পশ্চিম রণাঙ্গনে। তাই শেষ দৃশ্যে ট্রেঞ্চে একা বসে পল দূরে একটা পাতাবিহীন গাছের ছবি আঁকছে। দূর থেকে একটা পাখির ডাক শুনতে পায়। এ যেন সেই হারিয়ে যাওয়া লার্ক পাখি। ডায়েরির পাতায় ছবি আঁকতে শুরু করে পল। তারুণ্যের ভোরবেলায় যে লার্ক পাখির গান শুনেছিল পল সেই পাখির গান তার মনের মধ্যে আবার নতুন অনুরণন শুরু করে। তখন পশ্চিম রণাঙ্গন স্তব্ধ ছিল।

Sound of vernal shower on the twinkling grass,
Rain awakend flower. All that ever
was joyous, and clear, and fresh,
the music doth surpass.

এই মৃত্যু উপত্যকায় গভীর বিষাদের মধ্যেও এই পাখির ডাক যেন মুক্তির উল্লাস।

Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought.

আচমকা একটি বুলেট কেড়ে নেয় পলের জীবন। পলের হাত থেকে ডায়েরীটা পড়ে যায় জলের উপর। একটি মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যুযজ্ঞকে প্রকট করে তোলে। এই মৃত্যুর তীব্র হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে গোটা পৃথিবীতে। লার্ক পাখির মিষ্টি গানের বিপরীতে বেজে ওঠে মৃত্যুর এক করুণ সুর।

World should listen then as I am listening now.

১৯১৮ সালে ১১ই নভেম্বর শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হল। জার্মানির ঘাড়ে নেমে এল চূড়ান্ত অপমানের বোঝা। অবসান ঘটল অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের। চেকোশ্লোভিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোলান্ড প্রভৃতি নতুন দেশের জন্ম হল। জার্মানির পরাজয় ধীরে ধীরে জন্ম দিল আর্য জাত্যভিমানের। ত্বরান্বিত হল ফ্যাসিবাদের হুঙ্কার। জার্মানির অপমানের মধ্যে রোপিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ। যে বীজ মহীরূহ হয়ে উঠল ১৯৩৯ সালে। আর রেমার্কের উপন্যাস মাইলস্টোনের ক্যামেরাবন্দী হয়ে জন্ম নিল চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম সম্পদ। ১০০ বছর পরে রেমার্কের পল শুয়ে আছে কোনও অচেনা কবরে। শুয়ে থাকা সারি সারি মৃতদেহের পাশে তখনও হয়ত উড়ে যাচ্ছে নাম না জানা পাখিরা। সেই মৃতদেহরাই চিনতেন সোনালি পাখিটিকে যারা আজও শুয়ে আছে নিঃস্পন্দ হয়ে।

শুয়ে থাকা দেহদের পাশে
শেষ নিঃশ্বাসের হাতছানি
এক এই নিঃশ্বাসরাই প্রবেশ করছে আমাদের ভেতরে
আমরা সোনালি পাখিটির দিকে

অর্থিতা মণ্ডল